From: "Anwar Shahadat"

Date: Sun Sep 11, 2005 2:57 pm

Subject: book review 'sanjoa tale murga' by anwar shahadat in prothom alo

Dear Friends,

Anyone interested in reading the review of the novel ‘Sanjoa Tale Murga” (Chicken Under the Tank) by Anwar Shahadat (myself) published in Daily Protohm Alo “ on 9th September.

ক্যু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে

এ জেড এম আবদুল আলী

যারা এফ নেবেলের লেখা বিখ্যাত *সেভেন ডেইজ ইন মে* বইটি পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন কী চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য, সিরিয়াস আর থ্রিলিং ছিল সেই বইটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন সিনেটর, সেনাবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিলে সে দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা এবং শেষ মুহূর্তে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার ও কয়েকজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের চেষ্টায় সেটি ব্যর্থ করে দেওয়ার একটি কাল্পনিক অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এ বইটি এক সময়, সম্ভবত ষাটের দশকের প্রথম দিকে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল পাঠকদের মধ্যে। একটি ছবিও হয়েছিল সেই বইটি অবলম্বনে। আমার মনে আছে, কার কাছ থেকে যেন জোগাড় করে লুকিয়ে একটানা পড়ে ফেলেছিলাম বইটি। লুকিয়ে পড়া-কেননা আইয়ুবের আমলে সে বই ও ছবি দুটিই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল পাকিস্তানে।

যাই হোক, ‘ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন’ প্রবাদবাক্যটির কথা সত্য প্রমাণ করে ঠিক একই রকমের তিন দিনের একটি সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছিল আমাদের এই বাংলাদেশেও। সেটিও হয়েছিল ওই মে মাসেই। সেই *থ্রি ডেইজ ইন মে*র ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৬ সালের মে মাসে, যখন সংবিধান সংশোধন-পরবর্তী প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে সে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটনাটির সমাপ্তি ঘটেছিল তিন দিনের মধ্যেই। এ দেশের এক তরুণ লেখক, আনোয়ার শাহাদাত সেই তিন দিনের ঘটনার সূত্রটুকু ধরে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বইটির নাম *সাঁজোয়া তলে মুরগা*। বইটির মুখবন্ধ পড়লে জানা যায়, এ তরুণ লেখক বর্তমানে আমেরিকাপ্রবাসী এবং সেখানে সিনেমা শিল্পবিষয়ক কোনো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন ও ছবি তৈরি করছেন। বইটির উপজীব্য বিষয়টি হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি-সময় সময় সেনাবাহিনী কর্তৃক নিজের দেশকে দখল করে নেওয়ার বিষয়টি। অনেকেই প্রবন্ধ, বিশ্লেষণ বা গবেষণামূলক লেখা লিখেছেন, কিন্তু এ বিষয়ের ওপর এ রকম সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশে আর কেউ করেছেন বলে আমার আর জানা নেই।

অনেকটা সেই *সেভেন ডেজ ইন মে* পড়ার মতোই একটানা পড়ে ফেলেছি বইটি। তিরিশের দশকে রচিত ক্লাসিক যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস য়ারোশ্লাভ হ্যাসেকের *দি গুড সোলজার শোয়েইক* থেকে আরম্ভ করে একালের নরমান মেইলারের *নেকেড অ্যান্ড দি ডেড* প্রভৃতি উপন্যাসের কথা মনে আছে। আনোয়ার শাহাদাতের রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভরা, কিন্তু গভীর চিন্তা উদ্রেককারী এ বইটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে নয়। সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে

নেওয়ার বিরুদ্ধে। মনে পড়ছে, ষাটের দশকে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এম আর কায়ানি পাকিস্তানের প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের দু-তিন বছর পরই তার দু-একটি বক্তৃতায় ওই বিষয়ের ওপর চমৎকার কিছু মন্তব্য করেছিলেন। চমৎকার ইংরেজিতে, আদ্যোপান্ত রসিকতার ছলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিজের দেশ জয় করে নেওয়া, আইয়ুরের তথাকথিত বেসিক ডেমোক্র্যাসির (বার্ডস, বিস্টস অ্যান্ড বেসিক ডেমোক্র্যাট্স!) সমালোচনামূলক বক্তৃতা কটি দেওয়ার পর সুবক্তা হিসেবে তার জনপ্রিয়তা এত বেড়ে যায় যে, এরপর তিনি আরো কয়েক জায়গায় এ ধরনের বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং পরে এক সময়, তার জীবদ্দশায়ই সেগুলো একটি বা দুটি বই হয়ে প্রকাশিত হয়। *দি হোল ট্রুথ* ও *নট দি হোল ট্রুথ* নামে বই দুটি তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সে সময়ই তিনি তদানীন্তন সিভিল সার্ভিস সমিতির পূর্বপাকিস্তান শাখার এক সম্মেলনে চট্টগ্রামে বক্তৃতা দিতে এসে দুর্ভাগ্যবশত সেখানেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে, বলতে গেলে কোনো রকম চিকিৎসা পাওয়ার আগেই মারা যান। তার মৃত্যুর পর সেই অসাধারণ বইগুলোর আর কোনো রিপ্রিন্ট কখনো হয়েছিল কি না আমার জানা নেই। যদিও এ দুটি দেশেই ওই বইগুলোর প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরায়নি।

আনোয়ার শাহাদতের দু-একটি ছোটগল্প *প্রথম আলোর* সাহিত্য পাতায় পড়েছিলাম। সব কটিই খুব ভালো লেগেছিল। কখনো ব্যঙ্গের সুরে, কখনো শ্লেষের ভাষায় ও নিজস্ব একটি স্টাইলে বরিশালের কথ্যভাষা ও ঢাকা অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে সে গল্পগুলো মুগ্ধ করেছিল। আমি নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান গল্পকারের আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম। এমনি সময় এ বছরই প্রকাশিত এ বইটি হাতে এল। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে বইটির ঘটনাটি এই : সেদিন ভোরবেলায় ঢাকার টেলিভিশন ভবনের কাছে রামপুরা বাজারে একটি মুরগি বিক্রেতা হোসনা বেপারীর হাত থেকে ক্রেতা আজিজ মিঞার কাছে হস্তান্তর হওয়ার আগেই হাতছাড়া হয়ে ছুটে যায়। ক্ষণিকের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত মুরগিটি ছুটে গিয়ে পাশেই বড় রাস্তায় পড়ে এবং ঠিক সে সময়ই সেখান দিয়ে রামপুরা টিভি ভবনের দিকে ধাবমান একটি ট্যাঙ্কের চেইনের নিচে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং সমবেত বাজার করতে আসা মানুষজনের চোখের সামনে পিষ্ট হয়ে যায়। চোখের সামনেই ঘটনাটি ঘটতে দেখে সবাই হতভম্ব। কাছেরই এক মেসনিবাসী আবদুল আজিজ মিঞা তার গ্রাম সম্পর্কের এক ভাগ্নেকে তাদের মেসে খাওয়ানোর জন্য মুরগিটি কিনতে এসেছিল। অকস্মাৎ সেটির এ পরিণতি দেখে বাজারে উপস্থিত ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়াটি ঘটে অসহায়ত্ব ও অবাক বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে। সে দৃশ্য দেখে ভয়ও পেয়ে যায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মুটে কিশোর মেছেরুদ্দি। মাথা থেকে তার ঝুড়ি নামিয়ে দ্রুত বুকে থুথু দেয়, যেমনটি সে করত গ্রামে গোসাপ দেখে ভয় পেলে। যাই হোক, ক্রেতা আবদুল আজিজ মুরগির দাম দিতে গেলে বিক্রেতা হোসনা মিঞা তা নিতে অস্বীকার করে। 'মাল হাতে না পাইলে কোনোদিন খইদ্দারের হয় না, আমার হাত দিয়া মুরগা ছুইটা গেছে, ওডা আমার মুরগা গ্যাছেগা।' ক্রেতা আজিজ শুনতে চায় না সে কথা। টাকাটা দিয়ে দিতে চায় সে। 'খুন হইয়া যাওয়া মুরগাটার দাম আমিই দিয়া দি' বলে এগিয়ে আসতে চায় পাশের এক কলমিশাক বিক্রেতা।

এসব জটিল সমস্যার সমাধান হওয়ার আগেই ঘটনা মোড় নিতে থাকে অন্যদিকে। ওই ক্রেতা বরিশালের গ্রামে বড় হওয়া, বর্তমানে ঢাকার এক অফিসে বাগান-পরিচর্যাকারী আবদুল আজিজ, ১০ বছর ধরে ঢাকায় থাকলেও তার রক্তে বেজে ওঠে বরিশালের পুরনো দিনের ছন্দ। বহু দিন আগে নিজেদের গ্রামে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে সবার সর্বনাশ করতে পারার আগেই গ্রামসুদ্ধ লোক লেজা, রাম দা ইত্যাদি নিয়ে ভরপাশার বাঁধ কেটে দিয়ে সেই পানিকে অন্যদিকে ফেরানো চেষ্টায় সবার সঙ্গে নেমে গিয়েছিল আবদুল আজিজ মিঞা। অনেকটা সেই বাঁধ কাটার উত্তেজনা নিয়েই হঠাৎ সে তার লুঙ্গি গিঁট দিয়ে বেঁধে রাস্তার ডিভাইডার থেকে খসে যাওয়া একটি আধলা ইট নিয়ে সেই অপস্রিয়মাণ ট্যাঙ্ককে উদ্দেশ করে চিৎকার করে ওঠে, 'ফিরো সব ট্যাঙ্ক কইলাম, ফেরোও...।' ট্যাঙ্কের ভেতর বসে থাকা চালক ক্যাপ্টেন তমজিদ ও তার সঙ্গী সুবেদার মান্নান তখন সেই 'ব্লাডি সিভিলিয়ান মুরগির' বেয়াদবি সংক্রান্ত আলোচনা করছে। সুবেদার মান্নান, যার গ্রামের বাড়িতে মুরগি পোষা হয়ে থাকে তার জন্য ঘটনাটি অস্বস্তিকর হলেও ক্যাপ্টেন সাহেব মুরগির এই বেয়াদবিতে যারপরনাই অসন্তুষ্ট। সে জানে তার ভায়রা-ভাই জেনারেল মোহসিনউদ্দিন এ ক্যুর নায়ক। এ ক্যুর সফল পরিসমাপ্তির পর ভায়রা-ভাইয়ের

আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আর্মিতে তারই ব্যাচমেট একজনকে ওই মুরগির মতোই শেষ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন সাহেব তখন। কাজেই মুরগি হত্যা সংক্রান্ত জটিলতা তাকে বিচলিত করে না।

এদিকে আবদুল আজিজের আস্কালনে কৌতূহলী হয়ে প্রথমে দু-চারজন, পরে বেশ জোরেশোরে লোকজন জমা হতে থাকে ওই রাস্তায়। আজিজ মিঞার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাদেরও একই কথা, রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামার দরকার কী? মুরগি মারার দরকার কী? ফুঁসতে থাকে তারা। জমা হতে থাকে রাস্তার ওপর জনতা। প্রথমে খানিকটা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই, পরে তাদেরও একই প্রশ্ন-ট্যাঙ্ক কেন রাস্তায়? 'ওরা' কেন 'আমাদের' মুরগি মারবে? আসে সাংবাদিক, এসে যায় ক্যামেরাসুদ্ধ বিবিসির সাংবাদিক। অভিনব এ প্রতিবাদের খবর ছড়িয়ে যায় তাদের 'ব্রেকিং নিউজের' মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে। আজিজ মিঞার ভাগিনা ছাত্রনেতা এমরান আলমগীর মামার মেসবাড়িতে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় তার গ্রাম সম্পর্কের মামার হা-হুতাশ, লাফালাফি। আরো কয়েকজন মেসের বাসিন্দাসহ সেও এসে পৌঁছায় রামপুরা বাজারের সামনের রাস্তায় জনতার পাশে। সহজেই নেতৃত্ব তুলে নেয় নিজের হাতে। ওই মেসেরই পাশের বিরাট বাড়ির মালিক অ্যাডভোকেট জহির সাহেব, যিনি তার সুরম্য প্রাসাদলাগোয়া ওই টিনের ছাপড়ার মেসের উপস্থিতি পছন্দ করেননি কোনোদিনই, গোলমাল শুনে এগিয়ে যান। তারপর নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এক সময় ঠিক করেন, তিনিও যাবেন রাস্তার সেই জনতার পাশে। তার মেয়েরা এবং তার স্ত্রীও যোগ দেন সেখানে খানিক পরে। এদিকে ছাত্রনেতার বড় দু ভাই, সামরিক বাহিনীর দু ঊর্ধ্বতন অফিসারের স্ত্রীদের মধ্যে কথা শুরু হয় তাদের দেবর সম্পর্কে, যে দেবর কখনো তাদের বাড়িতে রাত না কাটিয়ে গ্রাম সম্পর্কে পাতানো মামার ওই ছাপড়ার মেসে রাত কাটাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে বেশি। ঘটনা এগিয়ে যেতে থাকে দ্রুতবেগে। ছাত্রনেতার মা, যিনি এক সময় ইংরেজিতে এমএ পাস করেছিলেন, বরিশাল থেকে টেলিফোন করেন তার বড় পুত্রবধূকে। কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল নিয়ে চিন্তিত তিনি। কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন তার। বড় পুত্রবধূর সঙ্গে সেসব কথাই আলোচনা করেন তিনি। এদিকে বিবিসির সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, লাখে লাখে জনতা ঘিরে রেখেছে, পাহারা দিচ্ছে তাদের পথে পাওয়া নেতাকে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা, বিচিত্র ব্যানার হাতে গৃহবধূরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা-সব এসে গেছে সেই রাস্তায়। তাদেরও একই প্রশ্ন-ট্যাঙ্ক কেন রাজপথে? অকারণে, কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিধবা না হতে চাওয়া সেনাবাহিনীর কিছু বধূও এসে জমা হয় সেখানে, তাদের ছেলেমেয়েরা আসে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যেন সবাই দলবেঁধে মেলার পথে চলেছে। আশপাশের ছাদে বসানো হয় পাহারা-চৌকি। কেউ যেন ক্ষতি না করতে পারে তাদের নেতার। বঙ্গভবনে সিভিলিয়ানদের এ বেয়াদবিতে ফুঁসতে থাকা ক্যু-নেতার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ একটি গুলি ছুড়তে পারে না ওই নেতার দিকে। রাস্তায় শুয়ে থাকা, বসে থাকা নারী-পুরুষের যেন একটিই কাজ, ওই তরুণটিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ট্যাঙ্ক যেন আর না এগোতে পারে তা নিশ্চিত করা। এক সময় টের পায়, মুরগি ঘাতক ট্যাঙ্কের ভেতর বসে থাকা দু সৈনিক-ক্যাপ্টেন ও সুবেদার-সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অন্যদের থেকে। তাদের পক্ষে আর ট্যাঙ্ক নিয়ে এগোনো-পেছানো কোনোটাই সম্ভব নয়। অসহায় বিহ্বলতা নিয়ে ওই ট্যাঙ্কের অন্ধকার গুহায় বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই।

বিচিত্র সব শিরোনামের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে এগিয়ে যেতে থাকে ঘটনা। সেনাবাহিনীর ওপরের দিকের কর্মকর্তাদের, তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্রতিক্রিয়ার বিবরণে সমৃদ্ধ হতে থাকে উপন্যাসটির কলেবর। এক সময় শেষ হয় সেই সেনা অভ্যুত্থান নাটকের। ট্যাঙ্ক বাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

কিছু কিছু জানা ঘটনার বর্ণনা, কিছু কিছু কল্পনা ও সত্যমিশ্রিত বিবরণ এবং কিছু রূপক ইত্যাদি মিশিয়ে রচিত এ উপন্যাসটি পাঠকদের উৎসাহকে টেনে নিয়ে যায় বইটির শেষ পর্যন্ত। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের কারো কারো চিন্তায় যে আজও কাজ করে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণের খোয়ারি, তা বেশ ভালোভাবেই ফুটে ওঠে লেখকের কলমে। বিশেষ করে এ ধরনের পরিস্থিতিতে একেকটি পরিবারের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া হয় তারও সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে বইটির কয়েকটি চরিত্রে। মূলধারার রাজনীতি থেকে খানিকটা দূরে থাকা ব্যতিক্রমধর্মী সাহসী ছাত্রনেতাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না পাঠক, ভালো লাগবে ট্যাঙ্কের গহ্বরে বসে থাকা সুবেদার মান্নানকেও।

‘প্রথাগত সংলাপ’হীন লেখকের নিজস্ব স্টাইলটি সম্যক উপভোগ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা বইটির অজস্র ছাপার ভুল ও বানান বিভ্রাট। তবে দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় এ ধরনের অভ্যুত্থানের কারণে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দেশের জনগণের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তার রূপটি, একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি ও সহমর্মিতার বদলে দু গ্রহের বাসিন্দার মতো একের প্রতি অন্যের সন্দেহের বিষয়টি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে লেখকের কলমে।

বইটি পাঠকদের ভাবাবে এবং আনন্দ দেবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ রকম একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস লেখার জন্য এ লেখককে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না পাঠক। বইটি আরো পাঠককে আকর্ষণ করুক, চাইবেন সবাই।

সাঁজোয়া তলে মুরগা; *আনোয়ার শাহাদত; ভুঁই-ক্ষেত পাবলিশার্স; ঢাকা ; ২০০৫*